পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

মিনারচূড়োর পরী-১

সে রাত ফিকে হবার আগে আমি স্বপ্ন দেখি। অনেকটা এইরকম - অক্টরলোনি মনুমেন্টের চূড়োর ঘেরা বারান্দায় দুজন লোক রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই পরিণত যুবক, মাঝারি উচ্চতার, রোগা, দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখ, চোখের চশমার কাঁচ ও ফ্রেম নীলকালো। পরী এরা। অশরীরী। রাস্তার মানুষ এদের দেখতে পায়না। এরা কিন্তু এই উচ্চতা থেকেও সবাইকে দেখতে পায়। দেখতে পায় কলকাতার সমস্ত অঞ্চল, সব মানুষ, সব ঘরের সব অনুপুঙ্খ। এরা একদিন এই শহরে জীবনযাপন করেছিলো। সেই সময় থেকে আজ অব্দি গোটা শহরের ইতিহাস এরা দেখতে পায়।

মাঝখানের মিনারের একেবারে টঙে এদের একজনকে দেখা যায়। রাস্তা থেকে। ডানাশুদ্ধু...

====

পর্দা ঘিরে ফেলেছে সব শহর
এক দৌড়ে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে এই ঘরে ঢুকে
আন্তঃক্রিয়ার জানলায়
কোষিক ভাষার দূরতাকে ঘুচিয়ে আরো কাছে
হাতের মুঠোয় কানাকানির চৌহদ্দিতে
পর্দা ক্রমশ ছোটো হয়েছে এইভাবে আর পৃথিবীর ওপর তার প্রলেপ
মাইল মাইল

সদিচ্ছেদের দুদিকে দুটো জীবনপর্ব
বার্লিন কি গাজার দেওয়ালের দুদিকে
দুভাবে বিক্ষত দুটো ইতিহাসের
কথা ভাবতে ভাবতে
পর্দার দুপ্রান্তের দেখা স্বপ্ন আর বাস্তব কল্পনা ও স্মৃতির
প্রেত যাতায়াতে
পর্দা এক বাতাসী

প্রস্রবণের কতোটা রাজহাঁস রাজহাঁসের কতোটা নাব্যতা
ছবির ওপর মনের আস্তর কতোটা
বাস্তবের ওপর এসে ছলাত ছলাত বাসনার পলি

লোকে বাইরে যায় কম পর্দার
====

যেখানে বস্তি এখন সেখানেই বইতো প্রাচীন নদী
এখন কিছুই নেই তরণী নেই নাবিক নেই
শুধু গণিকাদের পংক্তিটা এখনো সেখানে
যেখানে নদীর শেষ পলি পড়েছিলো দেখবে এখনো অল্প কাদা
শতাব্দী যুগ পেরিয়েও আর তার মধ্যে থরথর করছে
বৃষ্টির একমুঠো খেলনা হ্রদ সে নদী
যদিও নেই
====

হঠাৎ আকাশ কালো করে মহামারীর মতো ঝড় আসে। বিধ্বংসী, বিস্ফোরক ঝড়। যা শহরের প্রত্যেক ঘরবাড়ি, প্রত্যেক মানুষের ভেতর ঢুকে পড়ে। ঢুকে সাজানো অবস্থা চুরমার করে দেয়। তছনছ করে বেরিয়ে আসার পথে ঝড় একটা চোরাগোপ্তা কাজও করে। লুকনো বাক্সপেঁটরা থেকে সমস্ত চিঠিপত্র তুলে নেয়। গুগলের চৌর্যবৃত্তিকে হার মানিয়ে অদৃশ্য ফ্ল্যাশড্রাইভে নকল করে নেয় সব লোকের সমস্ত ইমেল। ৪৫ মিনিটের ঝড় থেমে গেলে মানুষের মন পরিষ্কার হয়ে যায়। কেবল হারানো চিঠি সম্বন্ধে তাদের তাদের যাবতীয় হুঁশ লোপাট। আর যাদের ইমেল চুরি হয়ে গেলো, তাদের তো সেসব জানার কোনো সম্ভাবনই রইলো না।

====
আমি দেখেছি স্বপ্নের যাতায়াত তার সাকার হয়ে ওঠা
তার ওপর নিচ
তার পর্দানশীনতা তার পর্দাভাস
স্বপ্নের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছিলো এইভাবে
একার দোকার সমষ্টির
আরামকেদারায় দুলন্ত মানুষের গোপন চলমানতা

চলে গেছে পর্দার পেছনে
উপাত্তরূপে স্বপ্ন সবার সকল স্বপ্ন
জমা পড়ে সে কোথাকার যেন না-ঠিকানা স্বপ্নশালে
তার ব্যাখ্যাও হয় নানারকম
কোনোটা সাবানতেলের কাজে লাগে কোনোটা ফ্যাশনের
কোনোটা উড়োজাহাজের জুতোনকশির
কোনোটা গীতিকবিতার

চাঁদ ছেড়ে
মেঘ সরে আসে ঘরে ছেয়ে যায় সিলিঙে ডিমার-আলোর খোপে
এন্টারটেনমেন্ট সেন্টারের কেঠোকায়ার পেছনে
রাজহাঁসের পাশে পাশে

===

ময়মনসিংহের দিকে বাঁক নিয়ে চলে যাবার ভান করে ঝড় আসলে ফিরে আসে মনুমেন্টের চূড়োয়। সমস্ত আনা চিঠি জমা হয় মনুমেন্টের ভেতর, সিঁড়িতে থাক থাক। অল্প হাওয়া দিলেই ওড়ে, একে অন্যের ওপর পড়ে আর পায়রার পাখার মতো শব্দ হয়। সব ইমেল জমা হয় ওই দুই অশরীরীর ক্রে-র তৈরি সুপার-কম্প্যুটর ল্যাপটপে। এরপর শাহরিক মনস্তত্ত্বের মোড় ঘুরে যায়। রাতারাতি। দুই যুবক পরী চিঠি প'ড়ে প'ড়ে মানব-মানবীর যোগাযোগ, সম্পর্ক, রহস্য, ইচ্ছের কথা জানতে থাকে। আর রহস্যময় ইমেল, চ্যাট ও ফেসবুক মেসেজ-মাধ্যমে ওদের মতে মানানসই ও মননসই মানুষদের সাথে মিলিয়ে দিতে থাকে।

====
যে ধরাছোঁয়ার খেলা নিচের বাগানে
শিশুদের প্রত্যেক ছুটে মূর্ত
আঠারো তলার বড়োদের ঘরে তার কোনো ধরতাই নেই
নেই সংজ্ঞা শনাক্তিকরণ

আমাদের সর্বনামে কোনো নামই নেই
আমাদের সর্বনামে লিঙ্গ উহ্য
পরি বললে পরী বললে আমরা মেয়ে বুঝি
বুঝিনা সার্বিকতা বুঝিনা প্রেত
যার লিঙ্গ আছে যোনি নেই
তবু তাকে অনবয়ব দেখি তার ওসব দেখতে পাইনা

দেখে পর্যবেক্ষক
আমাদের পর্যবেক্ষক দেখনসই
দেখবন্ধু
যে দেখে নিজেকে আমাদের ওপরে ভেতর দিয়ে
আভাসে ও রূঢ়তায় স্বচ্ছতায় দাঢ়্যে

যেমন স্ফটিকের রেকাবি ধরা আমাদের হাত দেখা
স্ফটিকের ভেতর দিয়ে দেখা

====

পরদিন ভোরে জেগে উঠে সবটা মনে পড়লো না, যতটুকু থেকে গিয়েছিলো ওপরের অক্ষরে সাজানো রইলো। অফিসে পৌঁছে কাজের প্রথম ঘন্টায় তিন-কাপ কালো কফির পর চার নম্বর কাপ ভরতে উঠে আরো ভাবতে শুরু করি। এখন আর স্বপ্নের ঘেরাটোপে বাঁধা নই। কল্পনা তার জায়গা নিচ্ছে। যুক্তি ভাবনাপথের ওপর দ্রুত জুড়ে পেতে দিচ্ছে রেললাইন। ভাবতে শুরু করলাম দূর থেকে যারা শহর দেখে তারা নিশ্চয় 'দূরদর্শন'-এর ব্যাপারে আগ্রহী হবে। আমেরিকার দূরদর্শনের একটি চ্যানেলে কাজ করে এক বন্ধুকে ফোন করি। সে আইডিয়া-সন্ধানী, আইডিয়া-গবেষক। নতুন ধারণা নির্মান করা যেমন তার কাজ, তেমনি সেই ঘেঁটে দেখা এই সব ধারণার ব্যবহার, বিস্তার ও সার্থকতা। তাকে বললাম আমার স্বপ্নের কথা। বললাম

- দেখো, এমন কি হয়? একটা টিভি-অ্যাপ যেটা ESP বোঝে?
- মানে এমন অ্যাপ আছে কি না?
- না। নেই সেটা জানি। বেশ খুলে বলি। ধরো এমন একটা অ্যাপ যেটা (কীভাবে জিজ্ঞেস কোরো না, কোনো এক উপায়ে) মানুষ যখন টিভি দেখবে তার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার Extra Sensory Perception, তার মনের সুপ্ত ইচ্ছে সব বুঝে ফেলে।
- মানে ...মানে... তুমি কি এমন কিছু নিয়ে গবেষণা করছো, না কী? আমি তো ঠিক...

বন্ধু ঘাবড়ে যায়

মনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে টিভি অ্যাপ। মনোবাসনার সবটা জেনে নিচ্ছে...

- মনে করো এটা একটা আইডিয়া...
- আইডিয়ার তো একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকবে...
- ধরে নাও আছে। মানুষের মনের ইচ্ছে, বাসনা, আগাম অবস্থা – এইসব বুঝে নিয়ে নিজের স্টক থেকে স্বয়ংক্রিয় এক পদ্ধতিতে - এক artificially intelligent auto-software এর মাধ্যমে - নানা অনুষ্ঠান কেটেকুটে এক ধরণের পঞ্চব্যঞ্জন বা কনককশন তৈরি করে নিয়ে দর্শককে দেখাতে থাকে। এক একজন দর্শকের জন্য এক এক রকম অনুষ্ঠান। সব tailor-made। এই অনুষ্ঠান যখন দর্শক দেখে তখন এই দূরদর্শন-অ্যাপ আরো এক কাজ করে। মানুষের একা-দোকা-যৌথ-সামুদায়িক মনভাবনা, তার মনের কথার উপাত্ত সংগ্রহ করে নেয়। সেই সব সংগৃহীত উপাত্ত দিয়ে যেমন স্বপ্ন গড়ে ওঠে, তেমনি তার বিশ্লেষণও হয়।
- বিশ্লেষণ?
- হ্যাঁ। এর জন্য একেবারে বিশেষ কিছু এজেন্সি আছে। তারা এই সংগৃহীত উপাত্ত নিয়ে নানাধরনের বাজারমুখি বিশ্লেষণ করে।
- সে তো গুগলও করছে। কত মোবাইল-ফোন অ্যাপ হয়েছে... ধরো তুমি গাড়ি চালাচ্ছো...পকেটে মোবাইল। বন্ধ মোবাইল। তবু ওই অ্যাপ কিন্তু চলছে। তুমি যে সব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছো যে সব দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছো তার স্যাটেলাইট চিত্র/তথ্য ইন্টারনেট মাধ্যমে অ্যাপনির্মাতার কাছে পাঠাচ্ছে। সেই অ্যাপনির্মাতা তখন তোমাকে তোমার মোবাইল ফোনে নানারকম পন্যের বিজ্ঞাপন পাঠাচ্ছে...
- হ্যাঁ, ওইরকম। তার মানে বুঝতে পারছো? সব বানানো, কল্পনা, স্বপ্ন নয়। অনেক বাস্তব এর সাথে ডাল ও সাপের মতো লতিয়ে।

বন্ধুর কথায় বুঝলাম কল্পনা আজ বানিজ্যের এতটাই মূলধন যে এইসমস্তই সম্ভব এবং এমন একটা কনসেপ্ট দাঁড় করিয়ে দেওয়াও যায়। হয়তো বহু দশক লেগে গেলো এই কনসেপ্টকে বাস্তবায়িত করতে। তবু সম্ভব। এখন এই দূরদর্শন-অ্যাপের সাথে মিনারচূড়োর ওই দুই পরীর কী সম্পর্ক?

মনে পড়ে যাচ্ছে একটা উক্তি – 'আমরা আদিম রয়ে যাবো ততোটাই, যতোটা আমাদের চূড়ান্ত সিরিয়াস রাখতে পারে। আমরা তাকাবো, পর্যবেক্ষণ করবো, সংগ্রহ করবো, প্রমাণ দেব, যাচাই করবো আর সংরক্ষণ'।

এই দুই পরী, মিনারচূড়োর পরী যেন এইটুকুই করতে চায়। আর এইভাবে তারা প্রত্যেক নাগরিককে আলাদা আলাদাভাবে এমন কিছু কলকাতা তুলে ধরে যা তার অজানা ছিলো – যা কোনোদিন কোনো সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের পক্ষে সম্ভব না। কেননা তারা যেটা দেন, সেটা এক ধ্রুবক মাত্র। প্রত্যেকের কাছে এক।

====

এই এক ভান্ড ভাঁড়
যেখানে আমাদের পড়ে যাওয়া যেকোনো পথের চুল
হাঁটতে শুরু করে দিলো আর অনুসরণ করি
অনুসন্ধানে

স্মৃতির হোল্ডল খুলে পড়ে গেছে হাওড়া স্টেশনে
বেরোয় শব্দের ডিবে   বিশেষণ জেলি রাংতায় মোড়া
আসে ভুলে যাওয়া বাক্যের সেইসমস্ত লম্বা চওড়া

অতিরিক্ত নির্দেশ প্রেরণাকে নষ্ট করে দেয়
বেশ তো হচ্ছিলো ঘুঙুর আর তবলার লয়কথা ও উপকথন
ভিওলার তালে মিলছিলো ট্র্যাপিজের দোলাচল
এ সময় কেন বাঘ আনলে ?
আর কি প্রয়োজন ছিলো ওই শঙ্করী চাবুকের !

===

হাওয়ার চরিত্র বদলে ফেলেছে এই দুই পরী। বাতাস এখন ভীষণভাবে উর্ধমুখী। আর সেই হাওয়ায় শহরের সমস্ত চিঠি, লুকোনো জিনিস, ইমেলের বায়বীয় - সব মিশে আছে। বাস্তবরূপে একে রূপান্তরিত করলে এক ক্কাথ-সাগরের মতো মনে হবে। ক্কাথ-সমুদ্র থেকে উঠে আসা এক সুনামি বা হারিকেন যেন। লেখক লেখেন – ‘ I think of a liturgy in which no one needs to be initiated into the meaning of words and sentences’।

এই হাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে আমার কলকাতা শহরের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। আমরা যা জানি সবই তো কোথাও না কোথাও লেখা আছে। কিন্তু পুঁথিগত ইতিহাসের বাইরেও তো একটা ইতিহাস আছে। মৌখিক ইতিহাস কি কেবল মৌখিক প্রেরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকে? নাকি আরো কিছু থেকে যায় ওর মধ্যে যা আমরা জানিনা না, জানতে পারিনি। এই প্রেরণের মধ্যে কীভাবে কাজ করছে ব্রেনওয়েভ, মোমের আলো জাগানো বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা, আমাদের হিপোক্যাম্পাসের কিছু অজানা কাজ, আর গল্পবলার এক অসামান্য জাদু? আমি জানিনা। জানিনার রোমাঞ্চের মতো তীব্রতর কিছু নেই। কেননা সেখানেই সম্ভাবনার কাদামাঠ একটু একটু করে সবুজ হচ্ছে।

====

পরীর ভূমিকা ও পরী...

পরীর ভূমিকা এখন একা অন্যমনস্ক গ্রীনরুমে বসে পায়ের নখ
খুঁটছে
পরী এসেছে তার পাশে
জানেনা পরীর ভূমিকা
জানবে কি করে! অদৃষ্টের গায়ে সুতো নেই শুধু না
তার গা-ও নেই তবু সে পরী
তাঁবুর বাইরে কেবল ভোলা মোদক
নরম জটিল জিলিপি গরম তেলে ছাড়ে
আর হাতির মাথার মাহুত হার্মনিকায় মেতে
নস্টালজ্যার উজ্জ্বলতা ফেরাচ্ছে

হাতিটা শোনে

তাঁবুর বাইরে হাতিটা শোনে। একা...

উষ্ণ বদ্ধ তাঁবুতে এখন পরীর ভূমিকা
যতো তার ঘাম ততো অশ্রু
অথচ পরী তার প্রক্ষিপ্ত বাহিরি -
তাকে সে দেখেনা
ঘাড়ের কাছে আসলেও না
পরী সে পুরুষ তার আশু চুরুটে নিঃশ্বাস পড়ে
নিটোল কাঁধ থেকে সে ঘ্রাণ নামে বৃন্তের দিকে
অথচ পরীর ভূমিকা জানেনা

====

এখন প্রশ্ন হলো কারা এই দুই পরী? আমরা কি জানি?

আমি জানি। বলছি। দুজনের নাম জানিনা, তাই ধরে নেওয়া যাক। একজনের নাম অনিমেষ। তার গল্প বহুবার শোনা। সোজা। নকশাল ছেলে ছিলো। খুব উগ্রপন্থী নকশাল। ২৭ বছর বয়স তখন। অনেক জেলটেল ঘুরে শেষে প্রেসিডেন্সি জেল। এমার্জেন্সির সময় তখন। একবার গোরাডিগরিতেও দু-তিন রাত্তির ছিলো। সেখানে কবি/লেখক/সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তও ছিলেন তখন। অনিমেষের সাথে আলাপ হয়। সেই বছরই কোনো সময়ে ময়দানের ভোরে পুলিশ ওকে ছেড়ে দিয়ে পেছন থেকে গুলি করে। কয়েকজন ভোরবেলার স্বাস্থ্যসন্ধানী এসব দেখেন।

আর দ্বিতীয়জনের নাম ধরা যাক সুশান্ত। সে রাজনৈতিক চরিত্র নয়। ফুটবল পাগল। ১৯৮০ সালের ষোলই অগাস্টের ইডেন-কান্ডে সে মারা যায় মাথায় ইঁটের ঘায়ে। বসিরহাটে বাড়ি ছিলো, ছাপোষা মধ্যবিত্ত। চটকলে কাজ করতো। কিন্তু বাংলা উপন্যাস পড়তো খুব। মৃত্যুকালে তার বয়স ২৩।

দেওয়ালের, ব্যবধানের মুখোমুখি দুজন...

(ক্রমশঃ)

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, মে, ২০১৩